আনন্দবাজার পত্রিকা

২৬ ডিসেম্বর, ২০১৯

কুমার রাণা

ঝাড়খণ্ডে জয় হল লোকবুদ্ধির

আরে ভাই, অসলি বাত থ্যয়লা, বাকি সব ম্যয়লা।” ঝাড়খণ্ড বিধানসভার ফল বেরোবার দু’দিন আগেও এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন দুমকা জেলার এক সাধারণ বিজেপি কার্যকর্তা। ভোটে জিততে টাকা মুখ্য, বাকি সব গৌণ— বিজেপির বুনিয়াদি স্তরের কর্মীরাও এমন একটা ধারণা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন পার্টির (আজসু পার্টি) সঙ্গে জোট না হওয়ায় বিজেপির ক্ষতির সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি: “গঠবন্ধন উঠবন্ধন, সব উড় যায়েগা, দো-চারঠো জো কম পড়েগা, খরিদ লেঙ্গে।”

খরিদ্দারি ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে, সবাই জানে। পার্টিগুলোর মধ্যে ধোয়া তুলসীপাতাও বিরল। তবু, ক্রয়-ক্ষমতার সঙ্গে ক্রয়-কৌশলের মিশেল ঘটানোর দক্ষতায় বিজেপি ফার্স্ট বয় বলে নাম কিনেছে, অন্যরা তার ধারেকাছে নেই। জনপ্রতিনিধি কিনে নেওয়ার অহঙ্কারী প্রত্যয়ের পিছনে এই অভিজ্ঞতাই বাস্তব রসদ। এবং, কে না জানে, বিশ্বাস ও আত্মজে ফারাক নেই— বিশ্বাসকে লোকে সন্তানের মতো লালন করতে সুখ পান। অতএব, এ-বছর মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচন ভিন্ন কথা বললেও বিজেপি কার্যকর্তারা সেটাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবতে পারেননি।

ভাবতে না পারলেই দেশের মঙ্গল। দর্পীর অহঙ্কার যত বলবান হয়, লোকবুদ্ধি ততই সক্রিয় হয়, তা সে ১৯৭৫-৭৭ কালপর্বের জরুরি অবস্থার ঘটনা হোক বা চলমান সময়ে ভারতের অন্তরাত্মাকে হত্যা করার একের পর এক উদ্যোগই হোক। সমাজের সুস্থতাকামী লোকেদের জন্য আশার কথা— ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচন এই লোকবুদ্ধির সক্রিয়তাকে আরও এক বার প্রমাণ করল। লোকেরা এমন ভাবে ভোট দিলেন যাতে বিজেপি টাকার থলে বার করার সুযোগই না পায়। ভোটের হাটে যাঁরা নিজেদের চড়া দামে বিক্রির কথা ভেবে পুলকিত হচ্ছিলেন, নির্বাচকরা তাঁদের সামনে থেকে সেই সুযোগটা আগেভাগেই কেড়ে নিয়ে তুলনামূলক ভাবে জটিলতাহীন অ-বিজেপি সরকার গড়ার রায় দিলেন।

ওপরের কথাগুলোতে উচ্ছ্বাস স্পষ্ট। কিন্তু, যে অবস্থায় এই নির্বাচন হল, তাতে উচ্ছ্বসিত না হতে পারা কঠিন। বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা (জেএমএম)-কংগ্রেস জোটটাকে নড়বড়ে বললে কম বলা হবে। গোটা কংগ্রেস দলের সংগঠন ঠিক ভোটের আগেই ধাক্কা খেয়েছে। গত পাঁচ বছরের বিজেপি শাসনে জেএমএম নেতৃত্বও এমন কোনও আন্দোলন সংগঠিত করেননি, যা দিয়ে তাঁরা এক প্রকৃত লোকহিতৈষী চরিত্র তুলে ধরতে পারেন। আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের দাবির পিছনে বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে অন্যতম দিক ছিল মূলবাসীদের অধিকার সুরক্ষিত করা। ঔপনিবেশিক শাসনের সময় থেকে এক দিকে বাইরে থেকে এসে বসত গড়া এবং অন্য দিকে ভূমিপুত্র ও ভূমিকন্যাদের উৎখাত হওয়ার ধারা স্বাধীনতা-পরবর্তী কালেও অব্যাহত। ১৮৯১ থেকে ১৯৫০ কালপর্বে এখানে বাইরের লোকের আগমন বেড়েছে চোদ্দো গুণ। অন্য দিকে, আদিবাসীদের নির্গমন ঘটেছে বিপুল মাত্রায়, লক্ষ লক্ষ লোক ভিটেমাটি ছেড়ে অসম-উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে মজুর হিসেবে বসত গড়তে বাধ্য হয়েছেন, এমনকি তফসিলভুক্ত হওয়ার সুযোগও তাঁদের জোটেনি। অ-আদিবাসী বহিরাগমন ও আদিবাসী দেশান্তরের ভারসাম্যহীনতার কারণে ১৯৫০ সালেও যেখানে ঝাড়খণ্ডে লোকসংখ্যায় আদিবাসীরা ছিলেন ৩৬ শতাংশ, সেটা আজ কমে দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশ। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে বিজেপি এখানে প্রথম অ-আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী বসায়। সাঁওতাল পরগনা টেনান্সি অ্যাক্ট এবং ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার যে সীমিত সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল, বিজেপি সরকার সেগুলোকে খর্ব করার উপক্রম করে। আদিবাসীদের যেটুকু জমি অবশিষ্ট আছে, প্রলুব্ধ কর্পোরেট নজর সেটুকুও কেড়ে নিতে আগ্রাসী হয়, সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে।

এর সঙ্গে নেমে আসে মানুষের ওপর নানা অত্যাচার। খাদ্য-সুরক্ষা, একশো দিনের কাজ, ইত্যাদি সামাজিক প্রকল্পকে আধারের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। লোকে অনাহারে মারা যান। অথচ, এগুলো নিয়ে আন্দোলনের কারণে জঁ দ্রেজ়-এর মতো সমাজশাস্ত্রী গ্রেফতার হলেও বিরোধী দলগুলো, বিশেষত জেএমএম, তেমন বড় আকারে আন্দোলনে নামেনি। গত ডিসেম্বরেও দুমকার গ্রামগুলোতে মুখর অভিযোগ শোনা গিয়েছে গুরুজি শিবু সোরেন ও তাঁর পুত্রের সক্রিয়তার অভাব নিয়ে।

বার্তা এল, 'আমরাই ভ্যানগার্ড'২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯

ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনে যে ফল পাওয়া গেল, তার কারণ নিয়ে কিছুটা আলোচনা আগের পর্বে ('ঝাড়খণ্ডে জয় হল লোকবুদ্ধির', ২৬-১২) করা হয়েছে। তার সূত্র ধরে প্রথমেই বলা দরকার রাজ্যের শিক্ষাচিত্রটির কথা। সে চিত্র, এক কথায় বললে, ভয়ানক। ২০১১-র হিসেবে সাক্ষরতার হার মাত্র ৬৬ শতাংশ। স্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয় বললে কম বলা হয়— জন্মকালীন গড় আয়ু জাতীয় গড়ের চেয়ে দু'বছর পিছিয়ে। আরও দুশ্চিন্তার কথা, যেখানে বিশ্ব জুড়ে পুরুষ অপেক্ষা নারীদের দীর্ঘজীবী হওয়াটাই জৈব-সামাজিক নিয়ম, সেখানে এ-রাজ্যে নারী-পুরুষের গড় আয়ুতে পার্থক্য অতি সামান্য। এর কারণ, নারীরা স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ প্রায় পানই না। তার কারণ, প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্যব্যবস্থা বলে প্রায় কিছু নেই। এবং এ-সবের কারণ হল, সরকার এ ব্যাপারে আদৌ নজর দেয়নি।

এরই সঙ্গে আছে চরম বৈষম্য। এক দিকে মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছেন, অন্য দিকে বিপুল বৈভব, যার কিছু অংশ চুইয়ে পড়ছে গ্রামগুলোতে, এবং গরিবদের চোখে আঙুল দিয়ে তাঁদের দারিদ্রকে দেখিয়ে দিয়ে ধর্ষকাম মজা পাচ্ছে।

এই অসাম্য রাজনীতিতেও প্রতিফলিত। টাকার থলে নিয়ে বৃহৎ বিরোধী দলগুলোর খুব অনীহা আছে এমন মনে করার ভিত্তি নেই। বিজেপির মতোই জেএমএম দলেরও বিজয়ী বিধায়কদের তিন-চতুর্থাংশই কোটিপতি (আশ্চর্যজনক ভাবে কংগ্রেসে বেশ কম, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ)। মুখ্যমন্ত্রী হতে যাওয়া জেএমএম নেতার ঘোষিত সম্পত্তিমূল্য আট কোটি টাকার বেশি, তাঁর ভ্রাতৃজায়া বিধায়কের সম্পত্তি দু'কোটির ওপরে। দেশের অন্যত্র এই পরিমাণ টাকা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কিন্তু যে রাজ্যে এখনও আদিবাসী শিশু ভাদ্র-আশ্বিনে ভাতের জন্য কাঁদে, কেটে নেওয়া ভুট্টার গাছ ক্ষুধা নিবারণে আখের মতো করে চিবিয়ে খায়, শুধু পেটে ভাতে 'ভাতুয়া' খাটে, যে রাজ্যে ৩৭ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে, ৩৫ শতাংশ লোক খেতমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন, এবং কোটি

টাকা মানে ঠিক কত সেটাই বহু লোক কল্পনায় আনতে পারেন না, সেখানে এই টাকাই নেতাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিত্তবৈষম্যকে উৎকট, অশ্লীল করে তোলে। এত কিছুর পরও লোকে জেএমএম-কংগ্রেস জোটের সরকার গড়ার পক্ষে যে এত স্পষ্ট রায় দিলেন, তা কেবল ঝাড়খণ্ডের বিশেষ পরিস্থিতির ব্যাপার নয়। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস পরাজয়ের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁর নেতাদের আড়াল করা তাঁর কর্তব্য, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির কর্তব্য অন্য ভাবে নির্ধারিত হয়। কাণ্ডজ্ঞান থেকে আমরা যে ব্যাখ্যা পাই, তা তিন কোটি লোকসংখ্যার এই প্রদেশের দরিদ্র, সুযোগবঞ্চিত, অপমানিত লোকসাধারণের মহত্তর উপলব্ধির দিকেই তাকাতে বলে। তাঁদের অনেকেই জানেন না, কোন নেতার কত টাকা। নতুন সরকার তাঁদের জন্য স্বর্গরাজ্য গড়ে দেবে— এমন প্রত্যাকাঙ্ক্ষা তাঁদের নেই। রাজনীতি স্ফটিকস্বচ্ছ হয়ে উঠবে, দুর্নীতির কলুষ তার ধার মাড়াতে পারবে না— নিজেদের তাঁরা এমন কোনও কল্পনারও হকদার বলে মনে করেন না। উল্টো দিকে, তাঁদের বেশির ভাগই এনআরসি, সিএএ, ৩৭০, বাবরি মসজিদ, তিন তালাক ইত্যাদি নিয়ে প্রায় কিছুই শোনেননি। কিন্তু অভিজ্ঞতাসঞ্জাত মানবিক বোধে তাঁরা এটা জেনেছেন যে, কোথাও একটা সাঙ্ঘাতিক গোলমাল হয়ে চলেছে। তাঁরা জেনেছেন এই দেশটার অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন। বর্তমান শাসকেরা তাকে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, যেখানে মানুষের কথা বলা অপরাধ, সরকারের বিরোধিতা করা ঘোরতর পাপ। এই দুর্ভাগ্যের বার্তা পড়বার জন্য নিরক্ষরতা তাঁদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

হুমকির ভাষা বোঝার জন্য অক্ষরপরিচয় লাগে না। যদি লাগত, তা হলে এই দেশটা গড়েই উঠত না। স্বাধীনতার লগ্নে ব্রিটিশ সাংবাদিক বলেছিলেন, বড় জোর দশ বছর, তার মধ্যেই ভারতীয় গণতন্ত্র নামক বস্তুটাই থাকবে না। ভবিষ্যদ্বাণী মেলেনি। মেলার কথা নয়। ভারতবর্ষের নির্মাণে যেমন বহুত্বই ভিত্তি, তার সুরক্ষাতেও সেই বিভিন্নতাই শক্তি। এনআরসি/সিএএ-র বিরুদ্ধতার পথ ধরে এ রাজ্য-সহ সারা দেশে বিভিন্ন পার্টি-ছাত্রদল-নাগরিক সমাজের যে আলাদা আলাদা সমাবেশ, সেটা যেমন ভারতীয় সমাজের বহুত্ববাদী কাঠামোটি ভেঙে ফেলার উপক্রমকে পর্যুদস্ত করার লড়াই, ঝাড়খণ্ড নির্বাচনও সেই ধারায় একটি যোগদান। এটা আসলে বিরোধী দলগুলোর কাছে লোকসাধারণের একটা বার্তা: “আমরাই ভ্যানগার্ড, তোমরা আমাদের অনুসরণ করো।”